ব্রাহ্ম সমাজ ও বাঙালি মেয়ে

সোনালী রায়

আজ আর একথা নতুন নয় যে, সমাজের উন্নতি বিষয়ক পরিমাপের একটি একক হল — মেয়েদের অবস্থান ও উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য। যে সমাজে মেয়েদের অবস্থা যত ভালো সেই সমাজ তত সভ্য ও উন্নত। এই তত্ত্বের সঙ্গে বাঙালি পরিচিত হতে আরম্ভ করেছে উনিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশক থেকে। ডেমস মিলের বিখ্যাত গ্রন্থ 'হিস্টরি অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া' (১৮১৮) তে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লেখা হয়েছিল, মেয়েদের উন্নতি আসলে মার্জিত সমাজ ব্যবস্থার অন্যতম শর্ত। এই তত্ত্বকে গ্রহণ করেই সমাজ সংস্কারের পথে পা বাড়ান আধুনিক ভারতের প্রাণপুরুষ রাজা রামমোহন রায়।[১] তাঁর বিখ্যাত আন্দোলন, সতীদাহ প্রথা নিবারণ প্রকৃতপক্ষে সমাজকে মার্জিত হয়ে ওঠার পথে বেশ কয়েক পা এগিয়ে দিয়েছিল! এই চিন্তাধারার উত্তরসুরি বিদ্যাসাগর, বিধবাবিবাহ ও স্ত্রী-শিক্ষা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন ওই একই উদ্দেশ্যে। নারীকেন্দ্রিক এই আন্দোলনগুলি আসলে সমাজ উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ সোপান — যা একদিন সমাজকে তুলে নিয়ে যেতে পারে অসীম উচ্চতায়।

বাস্তবে তা ঘটতে আরও একটু সময় লেগেছিল। কারণ উপরোক্ত সংস্কার আন্দোলনগুলি ছিল প্রায় একক ব্যক্তি নির্ভর। রামমোহনের সতীদাহ নিবারক কাজে সামান্য কয়েকজন প্রত্যক্ষ সমর্থক থাকলেও মূলত তিনিই নানা কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে আন্দোলনটি সচল রাখেন। বিধবা বিবাহের ক্ষেত্রে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার তুলনাহীন সহায়তাকে স্মরণ করেও একটু মনে রাখলেই যথেষ্ট, বিশিষ্ট বন্ধু ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে বিদ্যাসাগর লিখেছেন—

'আমাদের দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ বলিয়া পূর্ব্বে জানিলে আমি কখনই বিধবা বিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতাম না।'[২]

অর্থাৎ সমাজ সংস্কারের আদর্শগত ধারণ প্রতিষ্ঠিত হতে আরম্ভ করলেও কার্যক্ষেত্রে বাঙালি সমাজের সংযুক্তি ছিল অতি সীমিত। স্ত্রী শিক্ষার ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয়, বেথুন স্কুলের প্রথম কিংবা বারাসাত অথবা উত্তরপাড়ার বালিকা বিদ্যালয়ের সংবাদ তথ্যগতভাবে যতই গৌরবজনক হোক না কেন, এসবের সামাজিক সাফল্য ছিল অকিঞ্চিৎকর। এই সাফল্য আসতে আরম্ভ করে সাতের দশক থেকে — যখন এই সংস্কার আন্দোলনগুলি একক ব্যক্তির পরিবর্তে একটি গোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত হয় — সেই গোষ্ঠীর নাম ব্রাহ্মসমাজ। সময়ের দাবি, শিক্ষার প্রসার, পরিবর্তনের প্রেরণা — ইত্যাদি শর্ত মেনে নিয়েও বলতে হবে, বাঙালি জনসমাজের এই দলবদ্ধ কর্মকাণ্ড যেন বিশেষভাবে প্রয়োজন ছিল। বহুকাল ধরে চলে আসা অজস্র কুপ্রথা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নতুন স্রোতের প্রবাহিত করার জন্য যে মনোবলের প্রয়োজন হয় — তা একক ব্যক্তি নয়, একটি বৃহৎ গোষ্ঠীর কাছে লাভ করল বাঙালি সমাজ। ব্রাহ্মসমাজের দ্বারাই পরিচালিত হল বিদ্যাসাগর পরবর্তী যুগের সামাজিক - সাংস্কৃতিক আন্দোলন। এই সমাজের সুসংগঠিত কাজের মাধ্যমে বাঙালি মেয়েরা ক্রমশ মুক্ত বিশ্বের সন্ধান পেল। একুশ শতকের বিশ্বভুবনের পরিপ্রেক্ষিতে এই উন্নয়নকে সামান্য মনে হলেও সময়কালে এর গুরুত্ব ছিল প্রশ্নাতীত। সেই পরিস্থিতি বিচার করলে, ব্রাহ্মসমাজ এবং বাঙালি মেয়েদের সম্পর্ককে বঙ্গীয় সমাজ - ইতিহাসের একটি ইতিবাচক অধ্যায় হিসেবে গণ্য করতে হবে।

আলোচনায় প্রবেশ করার আগে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া দরকার। প্রথমত, আমরা সামগ্রিকভাবে 'ব্রাহ্মসমাজ' বলতে ব্রাহ্মদের বিভিন্ন গোষ্ঠীকেই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছি। এই ধর্মের বিভিন্ন শাখার মধ্যে নানা মতপার্থক্য থাকলেও নারী সমাজের উন্নয়নের প্রশ্নে কোনও বিতর্ক ছিল না। পদ্ধতিগত ভিন্নতা সত্ত্বেও উদ্দেশ্য ছিল একমুখিন।

দ্বিতীয়ত, আমরা জানি, বাংলার পৃথক সমাজ সচেতক গোষ্ঠী হল ইয়ংবেঙ্গল। ব্যক্তিগত স্তরে, এই গোষ্ঠীর অনেক সদস্যই বৃহৎ পরিবর্তনের স্মারক হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। সমাজ সংস্কারের নানাবিধ সূত্র তাঁরাই প্রথম জনসমক্ষে আনেন, নারীসমাজের উন্নতি বিষয়েও বহু প্রয়োজনীয় আলোচনা আরম্ভ করেন। কিন্তু আদর্শগতভাবে যতটা সমর্থন করেছেন, কার্যক্ষেত্রে ভাবনাকে ততটা বাস্তবায়িত করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।। বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু কাজ করলেও[৩] সমাজ সংস্কারের বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর তুলনা নিরর্থক। তাই, সংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্রে, গোষ্ঠীগতভাবে, ব্রাহ্ম সমাজের ভূমিকাই সর্বাগ্রগণ্য এতে কোনও সন্দেহ নেই।

উনিশ শতকের শুরুতে বাঙালি মেয়েদের অবস্থা ছিল হতাশাব্যঞ্জক। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা, এবং অশিক্ষা— এই চারটি কুপ্রথার শিকার হয়েছিল মেয়েরাই। বাঙালি শিক্ষিত যুবসমাজ পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে এসে একধরনের অনাস্বাদিত জীবনবোধের সঙ্গে পরিচিত হল, তৈরি হল সমাজজীবন সম্পর্কে নতুন চাহিদা। সেই চাহিদা পূরণের প্রথম ধাপই হল অন্তঃপুরের সংস্কারসাধন। অবশ্যই প্রথম পর্যায়ের সংস্কার করা ব্যক্তিগত জীবনে এই জাতীয় সংস্কার করতে সক্ষম হননি। রামমোহনের দুজন স্ত্রী কেউই লেখাপড়া শেখেন নি। বিদ্যাসাগরের স্ত্রীও যথাযথ শিক্ষালাভ করতে পারেন নি। বিশিষ্ট জনেরাই যদি এই দৃষ্টান্ত রাখেন, তাহলে

সাধারণ জনগণের কথা সহজেই অনুমেয়। যাই হোক যুবকদের চাহিদা তৈরী হল শিক্ষিত ও সংস্কারমুক্ত মানবসঙ্গিনীর জন্য। এই আকাঙ্খা পূর্ণ করার প্রথম ধাপই ছিল শিক্ষার আয়োজন করা। পত্রপত্রিকায় স্ত্রীশিক্ষা সপক্ষে বহু প্রবন্ধ লেখা হতে লাগল। পাশাপাশি সংগঠিতভাবে এই কাজের আয়োজন করল ব্রাহ্মসমাজ। শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নারীমুক্তির বিবিধ ধারণা অঙ্কুরিত হতে লাগল।

হিন্দু সমাজের একাংশও যে পরিবর্তনের জন্য সচেষ্ট হয়নি এমন নয়, বিদ্যাসাগর এবং মদনমোহন তর্কালঙ্কার রচিত বোধোদয় বা শিশুশিক্ষার মতো প্রাইমার রচনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো, রাধাকান্ত দেবের সহায়তায় ১৮২২ সালেই রচিত হয়েছিল গৌরমোহন আঢ্যের 'স্ত্রী শিক্ষা বিধায়ক', বেথুন স্কুল খোলার ১৫ দিনের মধ্যে রাধাকান্ত দেব নিজের বাড়িতে একটি বালিকা বিদ্যালয় খোলেন। উত্তরপাড়ায় জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বা বারাসতের কালীকৃষ্ণ মিত্র বেথুনের আগে থেকেই বালিকা বিদ্যালয় খোলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন – কিন্তু এই সবই ছিল কিছুটা দৃষ্টান্তমূলক প্রচেষ্টা। কোন মেয়েরা বিদ্যালয়ে পড়বে, স্ত্রী শিক্ষার লেখা নিবন্ধ সমাজের মানসিকতা পাল্টাবে কি না, ঘরে ঘরে মেয়েদের হাতে প্রাইমারগুলি পৌঁছে যেতে পারে কিনা, রাধাকান্ত দেবের বিদ্যালয়ে কারা পড়তে আসবে এবং কী পড়ানো হবে এসব বিষয়গুলি খুব বিস্তারিত চিন্তাভাবনা করা হয়েছিল বলে মনে হয় না। বাংলায় রীতিগত এবং সমষ্টিগতভাবে নারীমুক্তির ভগীরথ হল ব্রাহ্মসমাজই।

রবীন্দ্রনাথ 'ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা' প্রবন্ধে লিখেছিলেন—

'...যে সমস্ত প্রাণহীন অভ্যস্ত লোকাচারের জড় আবরণের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে হিন্দু সমাজ আপনার চিরন্তন সত্য সম্বন্থে চেতনা হারিয়ে বসেছিল, ব্রাহ্মসমাজ তার সেই আবরণকে ছিন্ন করবার জন্যে তাকে আঘাত করতে প্রস্তুত হয়েছিল।'[৪]

এই মত শুধু ধর্মীয় দর্শন নয়, সমাজ জীবন প্রসঙ্গে সমান তাৎপর্যপূর্ণ। অর্থহীন দেশাচার লোকাচার থেকে মেয়েদের উদ্ধারপর্ব শুরু হল। উনিশ শতকের বাংলায় মেয়েদের স্বাধীনচিন্তা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার মূল পর্বটি সাধিত হয়েছে ব্রাহ্মসমাজের সক্রিয় প্রয়াসে।

প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকা স্ত্রী শিক্ষার সপক্ষে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করে। তার আগে রামমোহন সতীদাহ সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন—

'স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোনকালে লইয়াছেন যে অনায়াসেই তাদের অল্পবুদ্ধি কহেন?'

এই চিন্তাকে একটি সম্মিলিত মত হিসাবে প্রকাশ করলেন তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত। পত্রিকার পৃষ্ঠায় নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত হল আর এই সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত রচনাগুলি প্রকাশের দয়িত্ব নিল তত্ত্ববোধিনী। এ থেকেই বোঝা যায় এঁদের কর্মপদ্ধতি ছিল সুচিন্তিত ও নির্দিষ্ট। বিধবাবিবাহের মত বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকে তত্ত্ববোধিনী তথা ব্রাহ্মসমাজ নারীমুক্তি বিষয়ে নিজেদের মতাদর্শ ও অবস্থানকে স্পষ্ট করে দিয়েছে। ব্রাহ্মসমাজের সদস্যরা নারীশিক্ষার আয়োজন করল দুভাবে। প্রথম পর্যায়ে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাড়ির মেয়েদের লেখাপড়া শেখালেন পুরুষরা। স্ত্রী ও ভগিনীদের শিক্ষিত করে তুলতে চাইলেন তাঁরা। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী, স্বর্ণলতা ঘোষ (মনোমোহন ঘোষের স্ত্রী) –তারই উদাহরণ। অন্যান্য ব্রাহ্ম নেতারা যেমন কেশবচন্দ্র সেন, বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী, অঘোর গুপ্ত, উমেশচন্দ্র দত্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী বা শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ির মেয়েদের শিক্ষার ভার নেন। অবশ্য কোন কোনও পরিবারের মেয়েরা কিছু পরিমানে শিক্ষা পেতেন। যেমন প্যারিচাঁদ মিত্র, শিবনাথ শাস্ত্রী ও জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর মা লেখাপড়া জানতেন বলে জানা যায়। যাই হোক, গৃহশিক্ষার মাধ্যমে প্রথম চর্চা আরম্ভ হলেও এতে সন্তুষ্ট না থেকে কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যোগে শুরু হল সুসংগঠিত 'অন্তঃপুর স্ত্রী শিক্ষা', শুরু হল দ্বিতীয় পর্যায়।

দূরদর্শী কেশবচন্দ্র সেন এবং তাঁর সহযোগীরা বুঝেছিলেন প্রগতিশীল পরিবারের মুষ্টিমেয় কয়েকজন প্রকাশ্য বিদ্যলয়ে গেলেও বৃহত্তরভাবে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হলে ঘরোয়া ব্যবস্থাই কার্যকর হবে। বস্তুত, বাল্যবিবাহের কারণে সামান্য বিদ্যাও চর্চা করার সুযোগ পেত না মেয়েরা। 'অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা' সেই কাজে অগ্রসর হল। ১৮৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মবন্ধু সভা প্রতিষ্ঠা করল এই শিক্ষাব্যবস্থা। ৫টি শ্রেণীতে বিন্যস্ত হল পাঠ্যবিষয়। প্রথম বর্ষে ছিল বোধোদয়, পাটিগণিত ও নামতা। ছাত্রীরা এই পাঠক্রম অনুসরণ করে যোগ্যতা অনুসারে পরীক্ষা দিতে পারত। বছরের চারবার পড়াশোনার অগ্রগতি সংক্রান্ত বিবরণ পাঠাতে হত। বছরে দুবার পরীক্ষা দেওয়ার নিয়ম ছিল। প্রথম বছরে ১৪টি ছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিল। একজন সমস্ত বিষয়ে কৃতিত্বের পরীক্ষা দেয়। পরের বছর অর্থাৎ ১৮৬৪ তে উমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত বামাবোধিনী পত্রিকা এই অন্তঃপুর স্ত্রী শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে। একটি পত্রিকার সহায়তায় এই ব্যবস্থা বিশেষ সাফল্য লাভ করল। পরীক্ষায় লেখা উচ্চমানের উত্তরও এ কাগজে ছাপা হত। তাছাড়া পরীক্ষা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি, সংবাদ, পুরস্কার প্রাপকদের নাম ও পুরস্কারের তালিকা সবই প্রকাশিত হত। ১২৭১ সালে পরীক্ষায় ব্রাহ্মবন্ধুর সভার পক্ষ থেকে ১২ জন ছাত্রীকে পুরস্কার দেওয়া হল। প্রাপকরা ছিলেন সরস্বতী, ব্রজেন্দ্রবালা, জগন্মোহিনী, গোলাপী, পান্নাময়ী, কাদম্বিনী, হেমন্তকুমারী, সৌদামিনী, চণ্ডীমনি, ক্যাতায়ণী, কৃষ্ণবিনোদিনী ও কমনীয়াকান্তা।[৫] পুরস্কার হিসাবে দেওয়া হয় - বই, ভাল বাঁধানো খাতা, কাচের দোয়াত, হাড়ের কলম প্রভৃতি।

ডাকযোগে পত্রিকা আনিয়ে পড়াশোনার রেওয়াজ বাড়ল বামাবোধিনী পত্রিকার কারণেই। এই পত্রিকা স্বাধীনভাবে কিছু বুনিয়াদী বিদ্যাচর্চার আয়োজন করল। বিশিষ্ট ব্রাহ্ম নেতা উমেশচন্দ্র দত্ত (সিটি কলেজের অধ্যক্ষ) -এর সম্পাদনায় এই পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৮৬৩ সালে। প্রথম সংখ্যা থেকেই পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল নারীশিক্ষার বিস্তার। তাই ভাষাজ্ঞান, ব্যাকরণ, ভূগোল, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞানলাভের উপযোগী প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে লাগল। অর্থাৎ সম্পাদক 'অন্তঃপুর স্ত্রী শিক্ষা' ব্যবস্থায় পুরোপুরি সন্তুষ্ট না হয়ে আরও সহজ ও স্বাভাবিকভাবে বিদ্যাচর্চার আয়োজন করে দিতে চাইলেন তিনি। দু-একটি উদাহরণ থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হবে—

ভূগোল, ভাদ্র ১২৭০

'...ভূগোল শিখতে হইলে প্রথমে পৃথিবীর আকার কিরূপ জানা আবশ্যক ... পৃথিবীর আকার একটি কদমফুল বা কমলালেবুর ন্যায় গোল। ইহার উপরিভাগ গোল, নিচে গোল ও সবদিকে গোল। ...পৃথিবীর আকার গোল বলিয়াই যে শাস্ত্রে ইহার বিবরণ জানা যায়, তাহাকে ভূগোল বলে।'

বিজ্ঞান শিক্ষা, জল বহুরূপী ভাদ্র, ১২৭০

'অনেক মানুষ বহুরূপী দেখিয়াছে তারা কখন বুড়ো, কখন সাহেব, কখন মোহন্ত নানান সাজ সাজে। কিন্তু জল যে কতরকম সাজ সাজিতে পারে তা অনেকে দেখে না। এই জল কখনো ধোয়া হয়ে আকশে উঠে, কখন মেঘ হয়ে নানা রঙ পরে, আবার বৃষ্টি হইয়া দেশ ভাসাইয়া দেয়, কখনও শিশির হয়ে ঘাসের মুক্তোগুলির ন্যায় দেখা যায়, কখনো কোয়াসা হইয়া দিক সকল অন্ধকার করিয়া রাখে,... মেঘ আর কিছুই নয় জলের একরকম আকার মাত্র।'[৬]

জনমত গঠন গরার জন্য এই পত্রিকা নানা নিবন্ধ প্রকাশ করে। শিক্ষা বিষয়ক সরকারী রিপোর্ট, প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা, নারীশিক্ষা বিষয়ে অসংখ্য রচনা সবই মুদ্রিত হয়। ব্রাহ্ম সমাজের উদারনৈতিক চিন্তা ও সমর্থনের মুখপত্র হিসেবেই বামাবোধিনী চিহ্নিত হয়েছিল। 'অন্তঃপুর স্ত্রী শিক্ষা'কে জনপ্রিয় করার অক্লান্ত প্রয়াস ছিল, কিছু মহিলা এই ব্যবস্থার দ্বারা শিক্ষিত হয়ে উঠেছিলেন, বামাবোধিনীর পাতায় সেই স্বাক্ষর দেখা গেল। পত্রিকায় মেয়েদের লেখা আহ্বান করা হল। ষষ্ঠ সংখ্যা থেকে নিয়মিতভাবে মেয়েদের রচনা প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম দিকে কবিতা, পদ্য প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম দিকে কবিতা, পদ্য প্রকাশিত হলেও পরের দিকে মননশীল গদ্য, নিবন্ধ, চিঠি লিখতে থাকেন মেয়েরা। তাঁদের মধ্যে অনেকেই 'অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা'র ছাত্রী। যেমন, ১২৭১ সালের আশ্বিন সংখ্যায় স্ত্রীমতী কমনীয়াকান্তা লিখেছেন 'ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা' নামক পদ্য; ইনি ১২৭০ সালের 'অন্তপুর স্ত্রীশিক্ষা'র পরীক্ষায় বিশেষ পুরস্কার প্রাপক। এই পত্রিকা সম্প্রদায় নির্বিশেষে জনপ্রিয় হয়েছিল। হিন্দু পরিবারের মেয়েরা দেবদেবী সংক্রান্ত কবিতা লিখলেও ব্রাহ্ম সম্পাদক তা বাতিল করেননি। প্রথম সংখ্যা এক হাজার খণ্ড বিক্রয় হবার পর দ্বিতীয়বার ছাপাতে হয়েছিল। নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন ৫০০ থেকে ৬০০। কলকাতা ছাড়া বিভিন্ন মফস্বল শহরে (কোন্নগর, নৈহাটি, হুগলি) এর চাহিদা ছিল। প্রথম বছরেই বিবি তাহেরন লেছা নামে এক মুসলিম নারীর লেখা প্রকাশিত হয়।

সময়কালে আরও দুটি পত্রিকাও এই জাতীয় দৃষ্টান্ত রাখে। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'অবলাবান্ধব' এবং প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত 'পরিচারিকা'। দুটি পত্রিকাই মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা ও চেতনাবৃদ্ধির ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা নিয়েছিল। দ্বারকানাথের স্ত্রী কাদম্বিনী গাঙ্গুলীর কথা আগেই বলা হয়েছে। মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষালাভের অধিকার স্থাপন করার বিষয়ে দ্বারকানাথের ভূমিকা সুবিদিত। 'অবলাবান্ধব' (১৮৬৯) পত্রিকায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাশাপাশি এই অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলার চেষ্টা হয়েছিল।

কেশবচন্দ্রের জীবনীকার প্রতাপচন্দ্র তাঁর ১৯ বছর বয়স থেকে ব্রাহ্ম সমাজের সদস্য। পরিচরিকা পত্রিকার (১৮৭৮) উদ্দেশ্য ছিল মেয়েদের শিক্ষার প্রসার ঘটানো। ইংরেজি সহ নানা বিষয় শেখানো হত। জীবনী, দেশকাল, ইতিহাস, ভ্রমণ - প্রভৃতি বিষয়ে রচনা প্রকাশিত হত। এই দুটি পত্রিকাতেই মেয়েরা লেখা পাঠাতেন। অবলাবান্ধব-এ পুস্তক সমালোচনা বা কোনও প্রবন্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে লেখা চিঠি ছাপা হয়েছিল। এসব নিদর্শন থেকে বোঝা যাচ্ছিল, মেয়েরা শিক্ষিত হবার সূত্রে আত্মপ্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করছেন না। ১২৮৬ সালের আষাঢ় সংখ্যায় 'অবলাবান্ধব' একটি কবিতা প্রকাশ করে। 'কোন বঙ্গীয় মহিলা কর্তৃক রচিত' এই কবিতাটি মেয়েদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন বার্তা।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রসারের কৃতিত্বও ব্রাহ্মসমাজভুক্ত অন্তঃপুরিকারাই দাবি করতে পারেন। বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার পর প্রথম দুটি দশকে তেমন উল্লেখযোগ্য বিদ্যাচর্চা হয়নি। এই সময়পর্বে বাঙালি সমাজ দ্বিধা কাটিয়ে ওঠেনি, ব্রাহ্মসমাজও এ বিষয়ে কাজ শুরু করেনি। ১৮৬৩-৬৪ সাল থেকে পূর্বকথিত অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা বা ব্যক্তিগত উদ্যোগের ফলে একটি সামগ্রিক পরিবর্তনের আকাঙ্খা বৃদ্ধি পায়। বিশিষ্ট ব্রাহ্ম নেতা ব্রজকিশোর বসু তাঁর কন্যা কাদম্বিনীকে ভরতি করলেন বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ে। সহপাঠিনী ছিলেন দুর্গামোহন দাশের কন্যা সরলা রায়। মনোমোহন ঘোষের উদ্যোগে ১৮৭৭ সালে বেথুন ও বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় সংযুক্ত হয়ে গেল এবং ১৮৭৮-এ এন্ট্রাস পরীক্ষা দিয়ে কাদম্বিনী সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। ১ নম্বরের জন্য তিনি প্রথম বিভাগ থেকে বঞ্চিত হন! তারপর তাঁকে নিয়ে শুরু হল এফ. এ. (বর্তমান ১২ ক্লাস) শ্রেণী। ১৫ টাকা বৃত্তিপ্রাপ্ত কাদম্বিনী ১৮৮০ সালে এফ.

এ. পাশ করেন। পরবর্তী পর্যায়, স্নাতকস্তরে কাদম্বিনী ও চন্দ্রমুখী বসু ভরতি হলেন।[৭] ১৮৮৩-তে বি. এ. পাস করার পর কাদম্বিনী ডাক্তারীতে ও চন্দ্রমুখী এম. এ. (ইংরেজি) ক্লাসে ভরতি হলেন।[৮] অনুমান করা সম্ভব, প্রতিটি স্তর পার হতে কি পরিমাণ সংগ্রাম করতে হয়েছে। দ্বারকানাথ, অন্নদাচরণ, শিবনাথ শাস্ত্রী সেই দায়িত্ব নিয়েছেন। চন্দ্রমুখী এম. এ. পাশ করেন ১৮৮৪ তে। কাদম্বিনী মৌখিক পরীক্ষায় অসফল হয়ে 'গ্রাজুয়েট অব বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজ' নামক একটি ডিগ্রী পান ১৮৮৬ তে। তৃপ্ত না হয়ে কাদম্বিনী বসু গ্লাসগো ও এডিনবরার উদ্দেশ্যে রওনা হন ১৮৯২ সালে। ১৮৯৩ সালে সম্মানজনক ডিগ্রি নিয়ে ফিরে এসে ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসা ও শিক্ষকতা শুরু করেন। এই সাফল্য সম্ভব হয় স্বামী দ্বারকানাথের অতুলনীয় কর্মক্ষমতা ও সংকল্পের জোরেই। চন্দ্রমুখী বেথুন স্কুলে শিক্ষকতা দিয়ে কাজ শুরু করে ক্রমশ কলেজের প্রিন্সিপাল পদে উত্তীর্ণ হন। এই জয়যাত্রা বাঙালি মেয়ের, যার যাত্রাপথ প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন প্রগতিশীল ব্রাহ্ম নেতারা। শিক্ষায় মেয়েদের সাফল্যে কথা বলার আগে আরেকটি ভিন্নধর্মী উদ্যোগের কথা বলতে হবে। ১৮৭০-এ ব্রাহ্ম নেতা শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বরাহনগরে একটি বিধবা আশ্রম স্থাপন করেন। ৪০ জন বিধবা নারী সেখানে শুধু আশ্রয় পায়নি, শিক্ষা ও স্বনির্ভরতার লক্ষ্যেও তাঁরা অগ্রসর হতে আরম্ভ করে। প্রথাসিদ্ধ বিদ্যালয়ে ভর্তি না হয়েও, কিছু মহিলা - সমাজ যাঁদের বাতিল করতে বা ভিন্নভাবে ব্যবহার করতে আগ্রহী, তাঁদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিলেন সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। সীমিত প্রচেষ্টা হলেও, হিন্দু সমাজের অন্যায়ের প্রতিবিধান করলেন শশিপদ — বিধবাদের সৎভাবে বাঁচার পথ প্রদর্শন করলেন তিনি।

যাই হোক, কাদম্বিনী-চন্দ্রমুখীর পর সংখ্যায় খুব বেশি না হলেও নিয়মিতভাবে এন্ট্রান্স ও পরবর্তী পরীক্ষায় মেয়েরা বসতে আরম্ভ করেন। কামিনী সেন, অবলা দাস, সুবর্ণপ্রভা বসু, নির্মলা মুখোপাধ্যায়[৯], কুমুদিনী খাস্তগির, ভার্জিনিয়া মেরি মিত্র, যামিনী সেন প্রভৃতি অনেকেই এন্ট্রাস এবং বি.এ., এম. এ, ডাক্তারি প্রভৃতি নানা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এইসব মেয়েরা অধিকাংশই ব্রাহ্ম ও খ্রিস্টান পরিবার থেকে আসতেন। হিন্দু মেয়েরা তখনও দ্বিধা কাটতে পারেননি। ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথের কন্যা ইন্দিরা ও স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা সসম্মানে এম. এ. পাশ করেন।[১০]

উচ্চশিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়তে থাকে। কিন্তু সমস্যা হয় মহিলা শিক্ষয়িত্রী প্রসঙ্গে। এই সমস্যা আগাম অনুমান করেই কিন্তু কেশবচন্দ্র সেন ১৮৭১ সালেই 'ফিমেল অ্যান্ড অ্যাডাল্ট নর্মাল স্কুল'। খোলেন, উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষয়িত্রী নির্মাণ। ১৭ জন বয়স্ক ছাত্রী নিয়ে এই স্কুল শুরু হল। শিক্ষিকা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন কেশবচন্দ্র। ক্রমশ ছাত্রী সংখ্যা বাড়তে থাকে। এই স্কুল থেকে পাশ করেন রামতনু লাহিড়ির ভাইঝি রাধারাণী। পরবর্তীকালে তিনি ৬০ টাকা মাইনেয় বেথুন স্কুলে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। ক্রমশ মেয়েরা এই জাতীয় কাজে আগ্রহী হতে থাকেন। (অবশ্য ১৮৬৩ সালেই পাবনায় ব্রাহ্ম হহিলা বামাসুন্দরী দেবী ২০ টাকা মাসিক বেতনে বালিকা বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষিকা হিসবে কাজ আরম্ভ করেন।) যাই হোক কেশব সেনের প্রচেষ্টায় বাঙালি মেয়েরা যেমন অন্তঃপুরে শিক্ষালাভ করল, তেমনই প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে যোগ দেবার দক্ষতাও অর্জন করল। প্রথম বছরের শেষে ২৪ জন ছাত্রী এই প্রশিক্ষণ লাভ করে। ১৮৯০ সালে সারা বাংলা বালিকা বিদ্যালয় ছিল ২২৩৮টি। সব ক্ষেত্রে না হলেও অনেক জায়গাতেই শিক্ষয়িত্রী পাওয়া সম্ভব হয়েছিল। পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গী যেমন তাদের প্রেরণা দিয়েছিল, তেমনই আত্মবিশ্বাস যুগিয়েছিল এই প্রথাসিদ্ধ শিক্ষা ১৮৯০ সালে ব্রাহ্মসমাজ একটি নিজস্ব বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। উমেশচন্দ্র দত্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র প্রমুখ ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসানোর উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় স্থাপিত হয়নি, সমাজের মেয়েদের মধ্যে ব্রাহ্মচেতনা সঞ্চারিত করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু দ্বারকানাথ যে বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত সে বিদালয় কতদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকবে? দুজন ছাত্রী ১৮৯৪ সালে অকৃতকার্য হলেও ১৯৮৫ সালেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসলেন দু'জন ছাত্রী। শিশিরকুমার বাগচী প্রথম বিভাগে এবং প্রমদা দাস দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হলেন। এগিয়ে চলল জয়রথ। উল্লেখযোগ্য, এই বিদ্যালয়ে প্রথম থেকেই একটি হস্টেল সংযুক্ত ছিল। হিন্দু সমাজের মেয়েরাও এখানে পড়তে আরম্ভ করল। ১৯১৬ সালের রিপোর্টে দেখা যায় ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের ২২৯ জন বালিকার মধ্যে ১১৬ জন হিন্দু বালিকা, ৬৮ জন ব্রাহ্ম! অর্থাৎ ব্রাহ্ম সমাজের ধারাবাহিক কার্যকলাপের প্রতি বৃহত্তর হিন্দু সমাজ যথেষ্ট আস্থা স্থাপন করতে পেরেছে। বস্তুত বিশ শতকের সূচনা থেকেই এই বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধর্মের মেয়েরা প্রবেশ করে। ১৯০৮ সালে সেফিয়া কাজী নামক যে মুসলিম মেয়েটি প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে, সে ১০ টাকা বিশেষ বৃত্তি লাভ করে। সমগ্র ভারতবর্ষে প্রথম প্রবেশিকা পাশ করা মুসলিম কন্যা হিসেবে এই স্বীকৃতি লাভ করে সোফিয়া, উজ্জ্বল হয় ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের নাম।[১১]

উনিশ শতকে যে কর্মস্রোত আরম্ভ হয়েছিল তা বিশ শতকেও মন্দীভূত হয়নি। কিছু কিছু সামাজিক বাধা আসতে আরম্ভ করেছিল, বিবাহের বয়স নিয়েও বাঙালি সমাজ নতুন করে ভাবতে আরম্ভ করে। এর ফলে মেয়েরা, বিশেষত শহরাঞ্চলে কিঞ্চিৎ মুক্ত আবহাওয়ার আস্বাদ পান। ব্রাহ্মণ পৃষ্ঠপোষণ হিন্দু মেয়েদেরও মনোবল

এনে দিল। হিন্দু বালবিধবা সরলাবালা মিত্র বেথুন স্কুলে পড়ে, বি. এ. পড়তে চাইলে আবার শুরু হয় সমস্যা। কারণ বেথুন কলেজে বিজ্ঞান বিভাগ খোলা হয়নি। অতএব আবার ব্রাহ্ম সমাজের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হল। ব্রাহ্ম পরিচালিত সিটি কলেজ সহশিক্ষা বা কো-এডুকেশন চালু করল, ডাক্তার নীলরতন সরকারের উৎসাহে। কলেজ কর্তপক্ষ এই দুই ছাত্রীকে বিজ্ঞান নিয়ে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে ভরতি হবার অনুমতি দিল। ১৯১২ সালে দু'জনেই পাশ করলেন। পরবর্তীকালে সুরীতি মিত্র বি.এস.সি. পাশ করলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম মহিলা বিজ্ঞান স্নাতক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন।

বিশ শতকে প্রবেশর পর বেথুন সহ আরো ৭/৮টি বিদ্যালয় থেকে মেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বসতে থাকে। সাফল্যের হারও ছিল সন্তোষজনক। ১৯২১ থেকে ১৯৪৭ -এর মধ্যে বেথুন বিদ্যালয়ের ৪০০ ছাত্রী এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করে। এরমধ্যে অন্তত ৪২ জন সরকারী স্কলারশিপ পায়। আভা সেন, প্রতিভা নিয়োগী এবম মঞ্জুরী দাশগুপ্ত যথাক্রমে ১৯২৩, ১৯৩১ ও ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়ে মাসিক ২০ টাকা করে বৃত্তি লাভ করেন।

প্রথম পর্যায়ের শিক্ষিত মেয়েরা, বিশেষত ব্রাহ্ম মহিলারা নানাস্থানে বিদ্যালয় বা সমিতি প্রতিষ্ঠা করে মেয়েদের উন্নতির পথ প্রশস্ত করে দিতে চেয়েছিলেন। পাটনায় অঘোরকামিনী দেবী (বিধানচন্দ্র রায়ের মা) ও দার্জিলিং ঃএ হেমলতা দেবী ও সুনীতি দেবী একটি করে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। দুর্গামোহন দাসের দুই কনা সরলা ও অবলা যথাক্রমে গোখেল মেমোরিয়াল ও ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের প্রতিষ্ঠা তথা প্রসারের মাঝে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯১০ -এ ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল, ১৯১৯ -এ নারী শিক্ষা সমিতি, ১৯২৫ -এ সরোজনলিনী দত্ত মেমোরিয়াল অ্যাসোসিয়েশন, ১৯২৭-এ বেঙ্গল উইমেন্স এডুকেশনাল লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থাগুলি গ্রাম - শহর নির্বিশেষে সব স্তরের মহিলাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য (বিশেষত প্রসবকালীন যত্ন), স্বনির্ভরতা প্রভৃতি বিষয়ে সচেতন করে তুলেছিল। ব্রাহ্ম মহিলাদের প্রগতিশীল ভূমিকা বাংলার মেয়েদের ক্রমশ মুক্তবিশ্বের দিকে নিয়ে যায়।

শিক্ষার মুক্তি উচ্চকাঙ্খার জন্ম দেয়। মেয়েরা নতুন চিন্তা চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রথাসিদ্ধ ভূমিকা নিয়ে বেরিয়ে এল, দেখা দিল আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার আগ্রহ, কীভাবে মেয়েরা পরদা প্রথাকে অস্বীকার করেছে, কীভাবে তাদের স্বাধীন চিন্তা, মতামত, সৃজনশীলতা প্রকাশিত হয়েছে, এবার সে কথা বলতে হবে।

পরদা প্রথার সঙ্গে মেয়েদের শিক্ষালাভের জটিল সম্পর্কটি চিন্তাশীল মানুষরা শতাব্দীর প্রথম দিকেই অনুধাবন করেছিলেন। ইয়ং বেঙ্গলরা দাবী করেছিলেন যে সব ব্যাপারেই পুরুষ ও মহিলা সমকক্ষ, অতএব প্রকাশ্য উপস্থিতির বিষয়ে কোনও বিতর্কই উঠতে পারে না। কিন্তু এই বৈপ্লবিক মতের প্রতি সমর্থন জানানোর মত মানসিকতা তখনও তৈরি হয়নি, বরং তিরিশ বছর পরেও কেশব সেন প্রভৃতির অন্তঃপুর স্ত্রী শিক্ষা পরোক্ষে পরদা বা অবরোধ প্রথাকে সমর্থন জানায়। কিন্তু শুধু শিক্ষা প্রসঙ্গে নয়, সামগ্রিক ভাবেই সমাজ অনুভব করল মেয়েদের বাইরে আসার প্রয়োজনীয়তা। বাংলার প্রথম আত্মজীবনীকার রাসসুন্দরী দেবীর বিবরণ থেকে জানা যায়, পুরুষ আত্মীয় তো দূরের কথা, উঠানে কর্তার ঘোড়া দাঁড়িয়ে থাকলেও রাসসুন্দরী সেখানে যেতে পারতেন না। হাস্যকর মনে হলেও এমনই ছিল লোকাচার!

নিজের পরিবারভুক্ত মেয়েদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিক্ষিত করে তোলার পাশাপাশি ঠাকুরবাড়ির ছেলেরা ভাঙ্গতে আরম্ভ করেছিল এই রীতি। বন্ধু মনোমোহন ঘোষকে লুকিয়ে অন্তঃপুরে নিয়ে এসেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। জ্যোতিরিন্দনাথ কাদম্বরীকে নিয়ে ময়দানে, ঘোড়ায় চড়িয়ে হাওয়া খেতে যেতেন। আর বিলেত থেকে ফিরে সত্যেন্দ্রনাথ মুম্বই অঞ্চলে চাকরি করতে যাওয়ার সময় স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। তার কয়েক বছরের মধ্যে জ্ঞানদানন্দিনী একা ইংরেজদের পার্টিতে যোগ দেন, একাই ছেলেমেয়েদের নিয়ে বিলেত যান।

ব্রাহ্ম সমাজের সদস্যদের মধ্যে দুর্গামোহন দাশের স্ত্রী ব্রহ্মময়ী দেবী ১৮৬৬ সালে একটি ধর্মসভায় যোগ দেন। বরিশাল শহরের এই ঘটনাটি একক মহিলার প্রকাশ্যে আগমনের অন্যতম দৃষ্টান্ত। অবশ্য এর আগে ১৮৬২ সালেই কেশব সেন তাঁর স্ত্রীকে ঠাকুর পরিবারের অনুষ্ঠানে নিয়ে এসেছিলেন আর ১৮৬৬ সালের প্রথম দিকে বাৎসরিক মাঘোৎসবে ৫০ জন মহিলা দেবেন্দ্রনাথ প্রদত্ত ধর্মীয় উপদেশ শোনার জন্য ঠাকুরবাড়িতে উপস্তিত হন। যদিও তাঁরা বসেছিলেন চিকের আড়ালে!

১৯৬৬ সালের নভেম্বর মাসে মেরি কার্পেন্টার কলাকাতায় এলে তাঁর সম্বর্ধনার আয়োজন করে ব্রাহ্মসমাজ। এই সভায় বেশ কিছু ব্রাহ্ম মহিলা উপস্থিত ছিলেন। বামাবোধিনী পত্রিকা প্রথমে এই কাজ সমর্থন করলেও পরে সমালোচনার ভয়ে কিছুটা রক্ষণশীল হয়ে পড়ে। কিন্তু প্রগতিশীল ব্রাহ্ম মহিলারা এতে দমে না গিয়ে তৈরী করলেন ব্রাহ্মিকা সমাজ। ধর্মীয় আচরণের পাশাপাশি শুরু হল সমাজদৃষ্টি বদলের অধ্যায়। ১৮৭২ সালে অন্নদাচরণ খাস্তগির এবং দুর্গামোহন দাসের পরিবারভুক্ত মেয়েরা উপাসনা সভায় পরদার বাইরে বসতে চাওয়ায় কেশব সেন তীব্র আপত্তি করেন। কিন্তু কয়েক মাস পর কেশব সেন এই অনুমতি দেওয়ার এই বিতর্ক স্তিমিত হয়ে যায়, মেয়েরা একটি বিশেষ অধিকার অর্জনের লড়াই-এ জয়ী হন।

অথচ কেশব সেনই ১৮৭০ সালে ভারত সংস্কার সভার পক্ষ থেকে গড়ে দিয়েছিলেন বামাহিতৈষিণী সভা। প্রতি শুক্রবার এই সভার সদস্যারা মিলিত হতেন প্রবন্ধ পাঠ ও অন্যান্য আলোচনার উদ্দেশ্যে। ১৮৭২ -এ প্রকাশ্য সভায় বসা নিয়ে যে মতপার্থক্য তৈরি হয়, তা থেকে কেশব সেনের স্ববিরোধিতার প্রমাণ পাওয়া যায় — অবশ্য সমগ্র শতক জুড়েই এ জাতীয় দ্বন্দ্বের নিদর্শন ছড়িয়ে আছে।

ব্রাহ্ম মেয়েরা সামাজিক জীবন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আরও একধাপ এগিয়ে গেল ১৮৭৯ সালের অগস্ট মাসে 'বঙ্গ মহিলা সমাজ' স্থাপন করার পর। রাধারাণী লাহিড়ি, কাদম্বিনী বসু, স্বর্ণপ্রভা বসু, কৈলাসকামিনী দত্ত, সরস্বতী সেন, কামিনী সেন প্রমুখ ৪১ জন সদস্য নিয়ে শুরু হল সমিতি। ধর্মীয় বিষয় নয় — শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজ নারী-পুরুষ সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয় নিয়ে শুরু হল আলোচনা। মহিলারা প্রবন্ধ পাঠ করতেন এবং তা ছাপার ব্যবস্থাও করেছিল এই সমিতি। এর আগে অবশ্য বিভিন্ন পত্রিকায় মেয়েদের লেখা স্বনামে বা ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু নিজস্ব সমিতি তৈরি করে নিজেদের বক্তব্য প্রকাশ্যে আনার কাজ শুরু হল বঙ্গ মহিলা সমাজের মাধ্যমেই। মজার বিষয় হল, আচরণগত ভাবে যথেষ্ট প্রগতিশীল হলেও খ্রিষ্টীয় মহিলাদের এ জাতীয় সভা তখনও ছিল না। পূর্বোক্ত ব্রাহ্ম মহিলাদের কাজে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৮৮১ সালে কামিনী শীলের নেতৃত্বে একটি খ্রিস্ট মহিলা সমিতি স্থাতি হয়।

ব্রাহ্ম মহিলাদের প্রকাশ্যে আসা বা সামাজিক জীবনে অংশ নেওয়ার প্রেরণা ক্রমশ বৃদ্ধি পায় শিক্ষার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে। স্বর্ণকুমারী দেবীর নেতৃত্বে ১৮৮৬ সালে সখী সমিতি স্থাপিত হলে সম্প্রদায় নির্বিশেষে বহু মহিলা এতে যুক্ত হলেন। অসহায় বিধবা ও কুমারী মেয়েদের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিল সখী সমিতি। লেখাপড়া ও হাতের কাজের শিক্ষা দিয়ে তাঁদের স্বনির্ভর করে তোলার চেষ্টা করা হল। বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে শিল্পবস্তু সংগ্রহ করে প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও করা হল। খ্রিষ্টান, মুসলিম ও হিন্দু সদস্যা থাকায় সমিতির মেয়েদের মধ্যে সংস্কৃতিক বিনিময়ের পরিসর বাড়ল। স্বর্ণকুমারী সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকাই এই সভার মুখপাত্র হিসেবে ব্যবহৃত হত। বহু সদস্যের লেখা প্রকাশিত হত, স্বর্ণকুমারী স্বয়ং বহু মূল্যবান রচনার মাধ্যমে বাঙালি নারী সমাজের কাঙ্খিত অবস্থানটি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন। তাঁর মতে পারিবারিক কর্তব্যের বাইরেও মেয়েদের অস্তিত্ব প্রসারিত হোক। পরচর্চা ও কলহবৃত্তি থেকে উত্তরণের জন্য মেয়েদের আহ্বান করেছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী।

রাজনীতির ক্ষেত্রেও প্রাথমিকভাবে ব্রাহ্ম মহিলাদেরই দেখা গেল। ১৮৮৯ খ্রি. জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনে স্বর্ণকুমারী দেবী ও কাদম্বিনী গাঙ্গুলি বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেন। পরবর্তী কালে স্বর্ণকুমারী দেবীর কনিষ্ঠা কন্যা সরলা সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ নেন। শুধু তাই নয়, বাংলার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রথম পর্বে তাঁরই উৎসাহে বহু যুবক শারীরিক প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রচালনা শিক্ষা করেন।

অত:পর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় থেকে বেশ কিছু বাঙালি মেয়ে সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন, পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তগুলি তাঁদের মনোবল যুগিয়ে দেয়। অবলা বসু ও তাঁর ননদ লাবণ্যপ্রভা বসু মেয়েদের মধ্যে স্বাদেশিকতার বোধ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেন নানাভাবে। ১৯২০-৩৬ পর্যন্ত অবলা বসু ছিলেন ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের সম্পাদক। স্বদেশী আন্দোলনের সময় স্কুলের মেরি কার্পেন্টার হলে সভার আয়োজন, জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস পালন, গান্ধিজীর কারাবরণের দিনে অনশন পালন, লাঠি ও ছোরা খেলা শিক্ষা— সবই সম্ভব হয়েছিল এই দুই ব্রাহ্ম মহিলার সক্রিয় উদ্যোগে। এমনকী লেডি অবলা বসুর বাড়িতে যে সঙ্গীতশিক্ষার ক্লাস হত, সেখানে একাধিকরার দেশাত্মবোধক গান শেখাতে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ! এই শিক্ষা বা চেতনার বিস্তার বাঙালি মেয়েদের ক্রমশ উদারনৈতিক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করেছে। কাদম্বিনী ও দ্বারকানাথের কন্যা জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় অধাপনার পাশাপাশি সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন। কলম্বো বুদ্ধিস্ট গার্লস কলেজে পড়াবার সূত্রে তিনি সিংহলী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে যোগ দেন। ১৯৩০ থেকে চাকরি ছেড়ে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে একাধিকবার কারাবরণ করেন। ১৯৪৫ সালে ২১শে নভেম্বর আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারের সময়, পুলিশের গুলিতে ছাত্র রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর প্রতিবাদে রাত বারোটার সময় পুলিশের ব্যূহ ভেদ করে উপস্থিত হন জ্যোতির্ময়ী। তাঁর বক্তৃতায় মনোবল ফিরে পায় সম্মিলিত ছাত্রদল। পরের দিন দ্বিগুণ ছাত্র এসে মিছিলে যোগ দেয়। কিন্তু শবদেহ নিয়ে এগোবার সময় মিলিটারী ট্রাক এসে জ্যোতির্ময়ী দেবীর গাড়িতে ধাক্কা দেয়, দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। অনুভব করা যায় কোন জ্বলন্ত শক্তির আধার ছিলেন তিনি— এই দৃষ্টান্ত বাঙালি মেয়েদের জয়যাত্রার অন্যতম উদাহরণ।

এছাড়াও শান্তিসুধা ঘোষ, কমলা দাশগুপ্ত, অমিয়া সেনগুপ্ত, জ্যোতির্ময়ী বসু প্রমুখ মহিলারা বিপ্লবী সংগঠনে যোগ দিয়ে, অস্ত্র লুকিয়ে রেখে, কারাবরণ করে, দেশের কাজ বা স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রথম দুবার ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ভুক্ত মহিলাদের আদর্শ ও নির্ভীক আচরণ তাঁদের পাথেয় হয়েছে। এই সঙ্গে অবশ্য ভগিনী নিবেদিতার ভূমিকাও স্মরণীয় স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুর পরে তিনি বাংলায় বিপ্লবী আদর্শ প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

সরোজিনী নাই, বাসন্তী দেবী, লীলাবতী মিত্র, উর্মিলা দেবী, সুনীতি দেবীর মত বিশিষ্ট ব্রাহ্ম মহিলাদের পাশাপাশি বহু সাধারণ মহিলাও অসহয়োগ আন্দোলন বা অন্যান্য রাজনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়েন। ১৯২৬-এ সরোজিনী নাইডু কংগ্রেসের সভাপতি হন। এর আগে ঢাকার দীপালী সঙ্ঘ (১৯২৪) ও পরে মহিলার রাষ্ট্রীয় সঙ্ঘ (১৯২৭) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বহু স্বল্পশিক্ষিত এমনকি নিরক্ষর মহিলা এ দুটি সঙ্ঘের সভ্য হতে দ্বিধাবোধ করেননি। দ্বিতীয় সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাত্রী লতিকা ঘোষের নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় যে মহিলা স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গঠিত হয়, তারা শহর ও মফস্বলে পিকেটিং -এর কাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। বহু মহিলা কারাবরণ করেন। পরবর্তী পর্বে মাতঙ্গিনী হাজরা, বীণা দাশ, কল্পনা দত্ত, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেরার এর মত বিপ্লবী নারীরা এই বাংলার মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছেন—একথা ভাবলেও গর্ব বোধ হয়।

১৮৭৮ থেকে ১৯৩০/৩০, কমবেশি পঞ্চাশ বছর সময়সীমার মধ্যে মেয়েরা পরদার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে— এই তথ্য আজও বিস্ময় জাগিয়ে তোলে। আসলে যাত্রা শুরু হওয়ার পর ক্রমশ নানাদিক থেকে তাঁরা প্রেরণা লাভ করেছিলেন। যাত্রার গতি ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করেছিল। এই গতির সামনে শতাব্দীলালিত নানা প্রতিরোধ তুচ্ছ হয়ে যায়। তারই স্বাক্ষর রয়ে গেছে মেয়েদের বাইরে বেরিয়ে আসার ইতিহাসে, স্কুল-কলেজ-সভা-সমিতি স্বেচ্ছাসেবায় বিলিয়ে দিয়েছিল নিজেদের কর্মশক্তি। সংখ্যাগত ভাবে খুব বড় না হলেও এই কাজের মাহাত্ম্য কোন ভাবেই ছোট করা যাবে না— কারণ, এভাবেই একটি খণ্ডিত সমাজব্যবস্থা ক্রমশ পূর্ণতার দিকে এগিয়েছে।

বাইরে বেরোবার ব্যাপারে মেয়েদের প্রথম প্রতিবন্ধকতা ছিল তাদের পোশাক। স্কুলে যাবার জন্য কেবল একটি পাঁচহাতি বা আটহাতি শাড়ি যথেষ্ট আবরণ নয়— এই তর্ক তুলে বহু রক্ষণশীল মানুষ বেশ নিশ্চিন্ত বোধ করেছিলেন। কিন্তু এতে আটকে থাকেনি নারী সমাজ। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ফরাসি দর্জির বানানো পোশাক পরে মুম্বাই গেলেও ক্রমশ আবিষ্কার করলেন পার্সি শাড়ি পরার ধরন। মনোমোহন ঘোষের স্ত্রী সরাসরি ইংরেজি গাউন-ই পরতেন। ১৮৭৪ সালে বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের একটি ছবি থেকে জানা যায় তারা মোটামুটি সর্বাঙ্গ আবৃত পোশাক পরে স্কুলে যেত। তবে অনেক ক্ষেত্রেই মেয়েরা ইওরোপীয় ও ভারতীয় পোশাকের অংশ বিশেষ জুড়ে একটি বিচিত্র পোশাক তৈরি করে পরতেন। ধীরে ধীরে মেয়েরা স্বচ্ছন্দ পোশাক নির্বাচন করে নিলেন। প্রথম দিকে সেমিজ ব্লাউজ শাড়ি ও চাদর পরতেন ব্রাহ্ম মহিলারা, ব্লাউজের হাতা হত কবজি পর্যন্ত। কিছুদিন পর সেমিজের বদলে পেটিকোট এল, ব্লাউজের হাত ছোট হল। তবে শিক্ষিত মহিলাদের মধ্যে চাদর ব্যবহারের প্রবণতা ছিল।[১২] কুচি দিয়ে বাঁদিকে আঁচল করে শাড়ি পরা আরম্ভ হয় বিশ শতকে প্রবেশ করার পর। কেশব কন্যা মহারাণী সুনীতি ব্রোচ ব্যবহার করে আঁচল সামলে রাখার প্রচল করেন। আজ এ বিষয়টি খুব সামান্য মনে হলেও, বস্তুত এটি ছিল একটি বাস্তব সমস্যা— যারা সমাধানকল্পেও ব্রাহ্ম মেয়েদের ভূমিকা উজ্জ্বল হয়ে আছে।

১৮৬০ সালে ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী বামাসুন্দরী দেবী লিখিত 'কি কি কুসংস্কার তিরোহিত হইলে এদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে' নামক গদ্যগ্রন্থটি বাঙালি নারীর প্রবন্ধ জাতীয় লেখার প্রাথমিক নিদর্শন। যুক্তিগ্রাহ্য ভাষা ও আবেগের অপূর্ব মিশ্রণে প্রবন্ধটি উজ্জ্বল। গৃহশিক্ষায় শিক্ষিত বামাসুন্দরী পরবর্তী কালে পাবনার একটি বালিকা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা হন।

হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েও কৈলাসবাসিনী দেবী অনুসরণ করেন বামাসুন্দরীকে। 'হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা' ও 'হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি' নামক দুটি প্রবন্ধ গ্রন্থ শিক্ষিত বাঙালি মহিলার মননের অপূর্ব নিদর্শন। ১৮৬৩ ও ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত এই দুটি গ্রন্থের সূচনাতেই বামাসুন্দরী দেবীর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছিলেন কৈলাসবাসিনী।

ব্রাহ্ম পরিচালিত পত্রিকাগুলিতে বিশেষ স্তম্ভ থাকত মেয়েদের জন্য। ১৮৬৪-১৮৬৫ থেকেই অজস্র পদ্য ও নিবন্ধ প্রভৃতি প্রকাশিত হতে থাকে। বামাবোধিনীর প্রথম দিকের লেখিকাদের মধ্যে শ্রীমতী রমাসুন্দরী, মধুমতী গঙ্গোপাধায়, ক্ষীরোদা মিত্র, সরস্বতী সেন, বিবি তাহেরণ লেছা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অবলাবান্ধব পত্রিকায় অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায় 'শরচ্চন্দ্র' নামক উপন্যাসের সমালোচনা কালে পরোক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রকেও কটাক্ষ করতে পিছপা হয়নি। এছাড়া সৌদামিনী দেব্যা; মায়াসুন্দরী, প্রসন্নময়ী, নিস্তারিণী, লক্ষ্মীমণি, অম্বুজাসুন্দরী সুষমাসুন্দরী প্রভৃতি লেখিকারা দ্বিধাহীনভাবে নিজের মত প্রকাশ করেন। বামাবোধিনী অবলাবান্ধব পরিচারিকা ও অন্তঃপুর চারটি পত্রিকার সম্পাদগীয় দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যথেষ্ট সহায়তামূলক।

স্বর্ণকুমারী দেবী আবির্ভাবের পর মহিলাচরিত গদ্য-পদ্য যে শিল্পসুষমায় মণ্ডিত হল তা এক কথায় অতুলনীয়। গল্প - উপন্যাস, কবিতা, গান, প্রবন্ধ ও বিজ্ঞানসংক্রান্ত রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর 'দীপনির্বাণ' বা 'কাহাকে' সমকালীন উপন্যাসের ধারায় বিশিষ্টতার দাবি রাখে। এই সময়েই শরৎকুমারী চৌধুরাণী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, কামিনী রায় বা মানকুমারী বসু লিখতে আরম্ভ করেন। এঁদের মধ্যে মানকুমারী বসু হিন্দু বিধবা। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সৃজনশীলতার কাছে রক্ষশীলতা পরাজিত হয়েছে। প্রায় একইসঙ্গে সাহিত্য ক্ষেত্রে

এসেছেন কৃষ্ণভামিনী, বিনয়কুমারী, প্রমীলা, প্রিয়ম্বদা, সরলা, পঙ্কজিনী। গদ্যে বিশেষত কবিতায় এঁদের অধিকার ছিল সহজাত।

গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রেও বাংলার মেয়েরা যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখালেন—ভারতী, প্রবাসী, বসুমতী, মানসীও মর্ম্মবাণী, বঙ্গবাণী প্রভৃতি সাময়িক পত্রে মেয়েরা বহু গল্প লিখে পাঠাতে লাগলেন। সামাজিক ও পারিবারিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে মেয়েদের জগতের ছবি আঁকা হল। কুমুদিনী, বসু, উর্মিলা দেবী, অমলা দেবী, নিরুপমা দেবী প্রভৃতি চেনা বা অচেনা মহিলার লেখা ক্রমশ এই ধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন। এসেছেন অনুরূপা দেবী, প্রভাতী দেবী, সরস্বতী, সীতা দেবী, শান্তা দেবীর মত দক্ষ লেখিকা। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত গল্প উপন্যাসের আগে লিখেছিলেন সমাজ সচেতক প্রবন্ধাবলী। পরবর্তী কালের অবরোধবাসিনী, পদ্মরাগ, মতিচূর প্রভৃতি উপন্যাস ও বেশ কিছু ছোটগল্প, বাঙালি মুসলমান মেয়েদের জগৎ জীবন সম্পর্কে পাঠককে সচেতন করে তোলে। বিশিষ্ট বাঙালি উদ্যোগপতি হেমেন্দ্রকুমার বসু তাঁর কুন্তলীন তেলের বিজ্ঞাপনকল্পে যে গল্প প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন, সেখানে অংশগ্রহণ করেন বহু বাঙালি মেয়ে, শুধু বাংলা নয়, লাহোর, অমৃতসর, লুধিয়ানা, পাটনা, গিরিডি এবং সুদূর বার্মা থেকেও মেয়েরা লেখা পাঠাতে থাকেন। বিশ শতকের প্রথম দিকে এই সাহিত্য প্রচেষ্টা মেয়েদের বিশেষ উৎসাহ দেয়। বলা প্রয়োজন, উপেন্দ্রকিশোরের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হেমেন্দ্রনাথও ছিলেন ব্রাহ্ম ভাবাপন্ন। তাঁর আজন্মা সুহৃদ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মতই তিনি মেয়েদের মুক্তি ও প্রতিষ্ঠার কথা ভাবতেন। তাঁদের আরও পাঁচটা গঠনমূলক কাজের পাশে এই চিন্তা বা কাজ হয়তো তেমনভাবে প্রকাশিত হয়নি, কিন্তু সমকালে এ জাতীয় কাজ বা নৈতিক সমর্থনের মূল্য ছিল অপরিসীম। এই কারণেই ১৮৬০-৬১ থেকে মেয়েরা ক্রমশ নানা সামাজিক বিতর্কেও অংশগ্রহণ করেছেন। পত্র পত্রিকায় মত প্রকাশ করা ছাড়া আর কোনও উপায় তাদের সামনে ছিল না। বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ ও বিধবা বিবাহের সপক্ষে তাঁদের মতামত প্রকাশিত হয়েছে, সোমপ্রকাশ পত্রিকার পৌষ, ১২৭৮ সংখ্যায় কুসুমকুমারী দেবী নামক জনৈক মহিলা কৌলীন্য প্রথার তীব্র সমালোচনা করে একটি চিঠি লেখেন। তাঁর সাড়ে চার বছর বয়সে একষট্টি বছরের এক বৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে কুসুমকুমারী লেখেন,

'...আমি স্বামী বর্তমান থাকতেও এইক্ষণ এতদূর অন্নবস্ত্রের কষ্ট পাইতেছি যে, অনাথা শব্দে আমি যথার্থই অভিহিত হইতে পারি।'

লেখিকা এরপর বিধবাদের মতো এই জাতীয় অনাথাদেরও পুনর্বিবাহ প্রচলনের দাবি জানিয়ে বলেছেন, 'পতি বা স্ত্রী পরিত্যাগের বিধি' হিন্দুশাস্ত্রে আছে, তবে কেন একালে তা নিয়ে ভাবা হবে না? চমকিত হয়ে ভাবি, বিবাহবিচ্ছেদের আধুনিক ধারণা কি তখন থেকে অঙ্কুরিত হতে আরম্ভ করেছিল? তা-ও একজন হিন্দু কুলীন কন্যার মনে? এই আধুনিকতার সুর বেজেছিল কয়েকটি পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতায়

সব লেখাই যে একসুরে বাঁধা ছিল, তা নয়। অনেকেই আধুনিকতা ও উচ্চশিক্ষাকে ঘর গৃহস্থালি বা পরিবার ব্যবস্থার পক্ষে অসুবিধাজনক মনে করেছিলেন। মানসকুমারী বসু, সত্যবতী দেবী, সুশীলাসুন্দরী মিত্র, স্বর্ণপ্রভা বসু, আমোদিনী ঘোষ, হেমন্তকুমারী গুপ্ত প্রভৃত লেখিকার মেয়েদের গৃহকর্মে উৎসাহিত করেছেন। আবার, শিক্ষিতা মেয়েদের একটি অতিরিক্ত দায়িত্ব ছিল, উশৃঙ্খলতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে প্রথাসিদ্ধ ভূমিকাতে স্থির থাকাই তাঁদের কাছে প্রত্যাশিত ছিল। পরিবার জীবনকে সুস্থির ও সুন্দর রাখার কাজ থেকে তাঁরা যেন বিচ্যুত না হয়—এ চেষ্টা চলেছে আগাগোড়া। গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, সেলাই, রান্না, ধাত্রীবিদ্যা, আলপনা দেওয়া—সব বিষয়েই পত্রিকার পক্ষ থেকে এবং মেয়েরা স্বাধীন ভাবে, লিখে পাঠিয়েছেন। এর দ্বারা একটি ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গৃহস্থালি দুপ্রান্তেই মেয়েদের যাতায়াত যেন সহজ ও স্বচ্ছন্দ এই প্রমাণ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। সমসাময়িক অজস্র লেখায় এই জাতীয় দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে। যাইহোক, সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে মেয়েরা ক্রমশ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। শৈলবালা ঘোষ জায়া, সরলাবালা সরকার, আশালতা সিংহের পর যখন বাণী রায়, আশাপূর্ণা দেবী, সাবিত্রী রায় বা সুলেখা সান্যাল, মহাশ্বেতা দেবীকে পেয়েছে পাঠক সমাজ, তখন বোঝা গেছে শিক্ষা অনুভব ও আত্মপ্রকাশের একটি বৃহৎ বৃত্ত সম্পূর্ণ করতে পেরেছেন মেয়েরা। ব্রাহ্ম পরিবেশ বা বাতাবরণের যে সদর্থক সহায়তা শুরু হয়েছিল উনিশ শতকের মাঝামাঝি, তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার সম্পন্ন হয়েছে। বাধা-বিঘ্ন বা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই যাত্রা মহৎ ও তাৎপর্যপূর্ণ —এর দ্বারা সমাজের আংশিক পরিমার্জন বা উন্নতি সম্ভবপর হল।

বাঙালি মেয়েরা সঙ্গীত ও নাট্যজগতে পা রেখেছে ঠাকুরবাড়ি ও রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ সহায়তায়। প্রান্তবাসিনী মহিলাদের নৃত্য-গীত চর্চার ঐতিহ্যকে 'ভদ্রলোক' বাঙালি প্রথম দিকে একেবারেই সুনজরে দেখেনি। ব্রাহ্ম সমাজই মেয়েদের শুধু নয়, ছেলেদের ক্ষেত্রেও নাচ-গান-নাটকের ঘোর বিরোধী ছিল। রঙ্গমঞ্চে সর্বদাই পতিতাপল্লীর অধিবাসিনীদের আধিপত্য ছিল— শিল্প হিসাবে বাড়ির মেয়েদের নাচ -গান শেখাবার কথা কেউ ভাবতেই পারেন নি। এই প্রতিকূল ধারণা ভেঙ্গে দিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথ। স্ত্রী নীপময়ীকে গান শেখাবার জন্য মহর্ষির কাছে অনুমতি চাইলেন, শুরু হল এক অধ্যায়। এরপর এই বাড়ির অন্যান্য

মেয়ে বউরাও এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হননি। প্রফুল্লময়ী (বীরেন্দ্রনাথের স্ত্রী) ও কাদম্বরী (জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী) ভাল গাইতে পারতেন। বাড়ি অভিনয়ে যোগ দিলেন জ্ঞানদানন্দিনী, কাদম্বরী, বর্ণকুমারী (রবীন্দ্রনাথের ছোড়দিদি)। এরপর ১৮৮০ সালে 'বাল্মিকী প্রতিভা'য় হেমেন্দ্রনাথের কন্যা প্রতিভা এবং শরৎকুমারী-র (রবীন্দ্রনাথের দিদি) কনা সুশীলা সরস্বতী ও লক্ষ্মী সেজে সবাইকে মুগ্ধ করে দিলেন। ১৮৮৮ সালের ৩০শে ডিসেম্বর একটি অভাবনীয় ঘটনা ঘটল, বেথুন স্কুলের প্রাঙ্গণে, সখি সমিতির উদ্যোগে 'মায়ার খেলা' অভিনীত হল। ঠাকুরবাড়ি ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরা প্রথমবার প্রকাশ্যে অভিনয়ে সামিল হলেন, যদিও উপস্থিত ছিলেন শুধু মহিলা দর্শকবৃন্দ। অতএব, একথা মানতে হবে, ব্রাহ্ম সমাজের ছুঁতমার্গ কাটিয়ে দেওয়ার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন ওই সমাজেরই সর্বোজ্জ্বল রত্ন। বস্তুত নারীর মাধুর্য্য, লাবণ্য, শিল্পসচেতনতা ও সংবেদনশীলতাও যে একটি সমাজের সামগ্রিক গঠনের কাজে লাগতে পারে একথাই প্রতিষ্ঠা করেন রবীন্দ্রনাথ।

ব্রহ্ম সমাজের মহিলা শাখা ব্রাহ্মিকা সমাজের মেয়েরা ব্রহ্মসংগীত শিখতে শুরু করেছিলেন উনিশ শতকের শেষের দিকে। মাঘোৎসবের অনুষ্ঠানে মেয়েদের গান শোনা যেতে লাগল। ঠাকুরবাড়ির কন্যা প্রতিভা 'সঙ্গীত সঙ্ঘ' নামে গান শেখার স্কুল খোলেন বিশ শতকের প্রথম দিকে। এরপর সমস্ত বাধা ভেঙ্গে গান রেকর্ড করলেন ব্রাহ্ম নেতা দুর্গামোহন দাসের ভাইঝি, চিত্তরঞ্জনের বোন, অমলা দাশ। এই দৃষ্টান্তে ক্রমশ উদ্বুদ্ধ হলেন 'ভদ্র' বাঙালি মেয়েরা। সাহানা দেবী, অপর্ণা দাশ, মালতী ঘোষাল, শান্তি দত্ত, অণিমা ঘোষ প্রমুখ শিল্পীরা রেকর্ড ও রেডিওতে নানা ধরনের গান গাইতে লাগলেন।

অভিনয়ের ক্ষেত্রে কেশব সেনের পৌত্রী সাধনা বসুর নাম স্মরণীয়। ১৯২৮ এর এম্পায়ার থিয়েটারে নৃত্য প্রদর্শন করে সমস্ত সমাজকে আলোড়িত করে দেন। তাঁর দুই বোন বিনীতা ও নিলীনাও নৃত্য ও অভিনয় করতেন। অভিজাত পরিবারের মেয়েদের শিল্প-সংস্কৃতিতে আগ্রহী করে তোলার বিষয়ে এঁরা তিনজন দৃষ্টান্ত স্বরূপ। এই বছরেই শিশির ভাদুড়ির দিগ্বিজয়ী নাটকে অভিনয় করেন ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী কঙ্কাবতী দেবী। তিনি ও তাঁর বোন চন্দ্রাবতী দেবী বাংলা নাট্য ও চলচ্চিত্র জগতের প্রবাদপ্রতিম অভিনেত্রী ছিলেন। মজ:ফরপুরের অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট গঙ্গাপ্রসাদ সাহুর এই দুই কন্যা বাংলার মেয়েদের শিল্পচর্চায় উদ্বুদ্ধ করেন। এরপর থেকে ভদ্রঘরের মেয়েরা আর দ্বিধা করেনি। শান্তিনিকেতনের মেয়েদের নাচ-গান-অভিনয়ের অংশগ্রহণের খবর তাদের শক্তি বাড়িয়েছে। ছাত্রী রেবা রায়, নন্দলাল বসুর মেয়ে গৌরী, কবির দৌহিত্রী নন্দিতা এবং আরও অনেক মেয়ে নাচ ও অভিনয়ে নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। এঁদের অনেককেই মঞ্চে নিয়ে এলেন রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী। অমিয়া, অমিতা, শ্রীমতী— ঠাকুর পরিবারের তিন বউ রবীন্দ্রসঙ্গীতে ধ্রুপদী ঐতিহ্য ধরে রাখলেন কণ্ঠে, যন্ত্রে শিষ্য- প্রশিষ্যের মাধ্যমে। প্রতিভার কথা তো আগেই বলা হয়েছে, রবীন্দ্রগানের স্বরলিপি তৈরি করার কাজে প্রতিভা ও ইন্দিরার ভূমিকা অবিস্মরণীয়। সুলেখিকা ইন্দিরা 'রবীন্দ্রসঙ্গীতে ত্রিবেণী সঙ্গম' নামে অতি মূল্যবান একটি বই লিখে রবীন্দ্রনাথের গান ও সুরের বিবিধ-উৎস নির্দেশ করেছেন। এছাড়া তাঁর অজস্র প্রবন্ধও ছিল সঙ্গীতবিষয়ক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক প্রাপ্ত এই নারী, শিক্ষা - শিল্প - ব্যক্তিত্বে বাংলা কাঙ্ক্ষিত 'ভদ্রমহিলা'র আদর্শ উদাহরণ। শিক্ষিত বাঙালি সমাজ, পরিবর্তনের ধারায় পদচারণা করার প্রথম পর্যায় থেকেই নির্মাণ করতে চেয়েছে এক নতুন নারীসত্ত্বা। যে কারণে, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ— প্রত্যেকের নারীচরিত্র নানাভাবে নতুন ভাবনা ও দর্শনকে প্রকাশ করেছেন। সমাজের একাংশে যে ধরণের প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল তার কিছু কিছু প্রতিফলন ঘটেছিল সাহিত্যে। আর বাস্তবে এই প্রত্যাশা পূরণ হতে আরম্ভ করেছিল ব্রাহ্ম সমাজ ও ব্রাহ্ম মেয়েদের উদ্যোগে, ইন্দিরা বা আরও কেউ কেউ হলেন সেই প্রত্যাশাপূরণের মূর্ত রূপ।

কর্মক্ষেত্রে মেয়েরা নিয়মিত ভাবে আসতে শুরু করেন উনিশ শতকের আটের দশক থেকে। পাবনায় বামাসুন্দরী দেবী বা ঢাকায় রাধারাণী দেবী অবশ্য যথাক্রমে ১৮৬৩ ও ১৮৬৬ সাল থেকেই চাকরি শুরু করেন মাসিক ২০ ও ৩০ টাকার বিনিময়ে। শিক্ষকতার পেশায় স্বচ্ছন্দ বোধ কেরছিল মেয়েরা। কামিনী সেন, কুমদিনী খাস্তগির বেথুন স্কুল ও কলেজে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। সরলা দেবী যান মাইশোর কলেজে অধ্যাপনা করতে। শুধু কাদম্বিনী নন, নব্বই-এর দশকে অন্তত চারজন মহিলা চিকিৎসক কলকাতায় চিকিৎসা আরম্ভ করেন। শরৎকুারী মিত্র, নিস্তারিনী চক্রবর্তী, হেমবতী সেন, যামিনী সেন, ভার্জিনীয়া মেরি মিত্র, বিধুমুখী বসু পাশ করেছিলেন কৃতিত্বের সঙ্গে। এঁদের মধ্যে শরৎকুমারী, বিধুমুখী, যামিনী সেন ও ভার্জিনিয়া মেরী মিত্র চিকিৎসা কর্মে যুক্ত হন। বিশের দশক থেকে চাকরি ও অন্যান্য কাজে যোগ দেওয়ার প্রবণতা বাড়ে। পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়াও ক্ষেত্র বিশেষে রুজি রোজগারের দায়িত্ব মেয়েদের উপর এসে পড়ে। ১৯২৫ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রচেষ্টায় মেয়েরা কর্পোরেশনের স্কুল ও আরও নানা বিভাগে যোগ দিতে থাকেন। নানা সরকারী দপ্তরেও মেয়েদের জন্য চাকরির ব্যবস্থা হয়। স্কুল কলেজের চাকরির ক্ষেত্রে মেয়েদের আগ্রহ ছিল সমধিক।

স্বল্প পরিসরে ব্রাহ্ম সমাজের সমস্ত কর্মোদ্যোগের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। হয়তো তার প্রয়োজনও নেই। আদর্শগত ভাবে তাঁরা যে পরিবর্তন প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন, সেই বার্তাটিই গুরুত্বপূর্ণ। একথা অস্বীকার

করা যায় না বিদ্যাসাগর, মদনমোহন ও আরো কয়েকজন হিন্দু ব্যক্তির প্রত্যক্ষ সহায়তা না থাকলে ব্রাহ্ম সমাজের কাজ আরও কঠিন হয়ে যেত। কিন্তু মূল দায়িত্ব নিয়েছিলেন তাঁরাই— সহায়তা করেছিলেন বহুকাল ধরে মার-খেতে থাকা নারীসমাজ। মেয়েরা এগিয়ে না এলে, সাহস না দেখালে, কষ্ট ও পরিশ্রমের জন্য পিছিয়ে গেলে কোনও উদ্যোগই সফল হত না। বিশেষত: সেই সূচনালগ্নে বিরুদ্ধতা ও সমালোচনাকে জয় করার জন্য যে মনোবল দেখিয়েছেন তাঁরা— তার তুলনা হয় না। ভারসাম্য রক্ষা করে চলার আপ্রাণ চেষ্টা করতে করতে অনেক ফুরিয়ে গেছেন, কিন্তু একটা একটা করে দরজা খুলে গেছে। পূর্ণ সাফল্য আজও অধরা, কিন্তু যাত্রাটি তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ তাতে সন্দেহ নেই। অন্তত আইনগত ও নৈতিক দৃষ্টিতে মেয়েদের সমানাধিকার আজ প্রতিষ্ঠিত। এই ইতিবাচক কাজের জন্য সেই প্রথম যুগের মানুষগুলিকেই বারবার স্মরণ করতে হয়।

বামাবোধিনী পত্রিকার শিরোনামে নিচে লেখা হত মহানির্বাণ তন্ত্রের শ্লোক— 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নত:'—কন্যাকেও যত্নের সঙ্গে শিক্ষা দিয়ে পালন করতে হবে। এই নির্দেশ সমাজকে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় মেনে নিতে হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মানতে হয়েছে মানুষ হিসাবে তার অধিকার।

শিক্ষা লাভ করে, অধিকার সচেতন হয়ে, সাহিত্য রচনা করে, অর্থোপার্জন করে মেয়েরা এগিয়েছে এক নতুন ভুবনের দিকে, যে ভুবন তাকে শুধু নারী নয়, মানুষ বলেও ভাববে। আত্মপ্রত্যয়ের বিশেষ দীপ্তি তাঁদের উজ্জ্বল করেছে, নিজেদের অনর্থক, মূল্যহীন ভাবার অভ্যাস থেকে সরে এসেছেন তাঁরা। না হলে কেনই বা হিন্দু রক্ষণশীল রাসসুন্দরী দেবীর 'আমার জীবনে' লেখা হবে—

> 'এই বইখানি আমার নিজ হস্তের লেখা।...অধিকারী মহাশয়েরা, তোমরা যেন অবহেলা না কর, দেখিয়া ঘৃণা করিও না অধিক লেখা বাহুল্য।'

ঐতিহ্যবাহিত ভূমিকায় থেকেও নিজের কাজকে মূল্যহীন ভাবেন নি তিনি। মানুষ হিসেবে নিজে নিজেকে মান দিয়েছেন— এই সত্য বুঝে নিতে পারলেই রাসসুন্দরীর অনন্যতা বোঝা সম্ভব। এই সুরের সঙ্গে আশ্চর্য ভাবে মিলে যায় বিপরীত মেরুর উচ্চশিক্ষিত নারী কামিনী রায়ের কাব্যপঙ্‌ক্তি—

> 'আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
> আসে নাই কেহ অবনীপরে
> সকলের তরে সকলে আমরা
> প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।'

—আর মুখাপেক্ষী, দয়াকাঙ্ক্ষী নারীসত্ত্বা নয়, অপরের অনুমোদনের উপর নির্ভর করবে না, বরং তারাই পূর্ণ মানব সত্ত্বায় পরিণত হয়ে সহায়তার হাত প্রসারিত করে দেবে। স্বার্থহীন, উদার উপলব্ধির এই উচ্চারণ সেই নারীসমাজের হৃদয়বার্তা— যার জন্য সাধনা শুরু করেছিল ব্রাহ্মসমাজ ও আরও অনেক মানুষ। এই উপলব্ধিতে উত্তীর্ণ হয়েই তারা অতিক্রম করেছেন বহু অন্যায্য শৃঙ্খল, বহু অন্যায় শাসন।

টীকা ও তথ্যসূত্র

১. রামমোহন তাঁ 'Preliminary Remarks- Breief Sketch of the Ancient and Modern Boundaries and History of Indian' (১৮৩২) বইতে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন

২. বিনয় ঘোষ বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, পৃ. ৪৫৩